মুসলিমদের একটি ঘাতক ব্যাধি – আল ওয়াহ্হান ও তার প্রতিকার

‘আমরা এমন জাতি, যারা নিতান্ত তুচ্ছ, নীচু জাত ছিলাম, আল্লাহ আমাদের মর্যাদা উঁচু করে দিয়েছেন ইসলামের মাধ্যমে। আমরা যদি অন্য কোন উপায়ে সম্মান কামনা করি, তবে আল্লাহ আবারো আমাদের নীচু করে দেবেন।’

~ উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু

পরিবেশনায়ঃ

ইসলামের আলো

মুসলিমদের একটি ঘাতক ব্যাধি – আল ওয়াহ্‌হান ও তার প্রতিকার

‘আমরা এমন জাতি, যারা নিতান্ত তুচ্ছ, নীচু জাত ছিলাম, আল্লাহ আমাদের মর্যাদা উঁচু করে দিয়েছেন ইসলামের মাধ্যমে। আমরা যদি অন্য কোন উপায়ে সম্মান কামনা করি, তবে আল্লাহ আবারো আমাদের নীচু করে দেবেন।‘

~ উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু

“সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব - যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের আউলিয়া (সাহায্যকারী বন্ধু, অন্তরঙ্গ, অভিভাবক) বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।“

~ সূরা নিসা ৪:১৩৪-১৩৯

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

‘শীঘ্রই মানুষ তোমাদেরকে আক্রমন করার জন্য আহবান করতে থাকবে, যেভাবে মানুষ তাদের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য একে-অন্যকে আহবান করে।’

জিজ্ঞেস করা হলো, **‘তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হবো?’**

তিনি বললেন, **‘না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত কিন্তু তোমরা সমুদ্রের ফেনার মতো হবে, যাকে সহজেই সামুদ্রিক স্রোত বয়ে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন (অর্থাৎ তারা তোমাদের ভয় করবে না) এবং তোমাদের অন্তরে আল-ওয়াহ্হান ঢুকিয়ে দিবেন।’**

জিজ্ঞেস করা হলো, **‘হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল- ওয়াহ্হান কি?’**

তিনি বললেন, **‘দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং ক্বিতাল (যুদ্ধ) কে অপছন্দ করা।’**

~ মুসনাদে আহমদ, খন্ডঃ ১৪, হাদিস নম্বরঃ ৮৭১৩, হাইসামী বলেছেনঃ হাদিটির সনদ ভালো, শুয়াইব আল আর নাউতের মতে হাদিসটি হাসান লি গাইরিহি

সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হাদিসে এসেছেঃ

‘দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।’

~ সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদ, হাদিস হাসান

এই হাদিস নিয়ে একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় আসলেই রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘অল্পকথায় অনেক কথা প্রকাশ করা’র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিলো।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

‘পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের উপর ছয়টি বিষয়ে আমাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। **আমাকে দেয়া হয়েছে অল্প শব্দে অনেক বেশী অর্থবোধক কথা বলার যোগ্যতা, আমি অনেক দূর থেকে শত্রুবাহিনীর মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বিজয় প্রাপ্ত হই।** গনিমত তথা পরাজিত শত্রুবাহিনীর ফেলে যাওয়া সম্পদ আমার জন্যে বৈধ করা হয়েছে। যমিনের মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং সেজদা প্রদানের স্থান বানানো হয়েছে। সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য আমাকে নবী বানানো হয়েছে এবং আমার মাধ্যমেই নবী আগমনের ধারাকে সমাপ্ত করা হয়েছে।’

~ মুসলিম ৫২৩

ওয়াহহান সম্পর্কিত আলোচ্য হাদীসে মাত্র কয়েকটি বাক্য রয়েছে, কিন্তু এর মধ্যেই মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা, তাদের মূল সমস্যা এবং তার সমাধান নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদিস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে নীচে উল্লেখ করা হলো:

- **প্রথমত: 'শীঘ্রই তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য লোকজন একে অন্যকে আহবান করবে, যেভাবে খাবারের জন্য আহবান করা হয়।'**

'শীঘ্রই' কথার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি যে দ্রুত ঘটতে যাচ্ছে তাই বোঝা যাচ্ছে। এই হাদীসের অসাধারণ একটি বিষয় হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রোতাদের মনের সামনে যেন একটি বাস্তব স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে, মুসলিম উম্মাহকে প্রথমে তুলনা করা হয়েছে, কিছু ক্ষুধার্ত লোকের সামনে রাখা সুস্বাদু খাবারের সাথে। কিন্তু, যেহেতু তারা ভাগাভাগি করে খাবে একারণে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ থেকে ভাগ নিতে চাইবে, ফলে খাদ্যটি ভাগ হয়ে যাবে 'আমন্ত্রিত অতিথি'র মর্যাদা ও ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে। এই কাফেররা একে অপরকে আহবান করে তৈরি করেছে 'জাতিসংঘ'। তারা দলবদ্ধ হয়ে এখন মুসলিমদের আক্রমণ করছে, আর মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

খিলাফত পতনের অল্প কিছু সময় পর থেকেই, মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে দেয়া হল বিভিন্ন রাষ্ট্রে, ইউরোপিয় দখলদারি শক্তি এটা করেছিল। এবং তাদের প্রত্যেকেই এরপর নজর দিল মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ যে প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েছেন সেদিকে। সত্যিই বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ দলে দলে বিভক্ত, আল- কুরআনও সুন্নাহ হতে দূরে সরে যাওয়ার কারণে। এই অবস্থায় দুনিয়ার অন্যান্য জাতি, মুসলিম উম্মাহর উপর সরাসরি আক্রমণ চালাচ্ছে এবং একে অন্যকে আক্রমণের জন্য উৎসাহ দিচ্ছে, একদেশের মুসলিমদের আরেক দেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছে এবং যুদ্ধ সৃষ্টি করেছে। যেমন : ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ফিলিস্তান, কাশ্মীর ইত্যাদি-সেটা তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য হোক অথবা খনিজ সম্পদ দখলের জন্য হোক অথবা অর্থনৈতিক বাজার দখল করার জন্য হোক।

কেউ আক্রমণ করছে সরাসরি আগ্রাসী সেনাবাহিনী পাঠিয়ে, কেউবা কুটনৈতিক (diplomacy) এর মাধ্যমে, কেউবা আদর্শিকভাবে (ideologically), কেউবা সংবাদ মাধ্যম, প্রিন্ট কিংবা

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে, কেউবা তাদের আবিস্কৃত শিক্ষা-ব্যবস্থা রপ্তানী করে তাদের মানসিক দাস তৈরির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই মানসিক দাসেরা পশ্চিমা দেশের অপ সংস্কৃতিকে মনে করে আধুনিকতা আর ইসলামের পবিত্রতা আর সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থাকে মনে করে পশ্চাদপদতা, তারা কুফফারদের পরিচালিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মানব রচিত মতবাদ গ্রহণ করতে মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করে আর ইসলামের শিক্ষা অনুসারে দেশ, রাষ্ট্র পরিচালনা করতে বাধা দেয় ।আর এক্ষেত্রে তারা 'গণতন্ত্র রক্ষা, মানবতা, নারী-মুক্তি, শিশু-অধিকার, সবার জন্য শিক্ষা, সামাজিক-উন্নয়ন' ইত্যাদি বিভিন্ন মনভুলানো চটকদার শব্দের মোড়কে তাদের এই দালালী কার্যক্রমকে ঢেকে নিয়েছে।

বস্তুতঃ ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংস করার পর থেকেই পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর উপর এই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে অনবরত, এটা যারাই আল-কুরআনে বর্ণিত আনআম (গবাদি-পশু) এর মতো নয়, তারাই জানেন ও বুঝেন।

আল্লাহ বলেনঃ

"আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা (মুসলিমরা) যদি এমন ব্যবস্থা না কর (পরস্পরের সহযোগী না হও), তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।"

~ সূরা আনফাল ৮:৭৩

- **দ্বিতীয়ত: ‘তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হবো?’ তিনি বললেন, ‘না, বরং তোমরা তখন অগণিত হবে।’**

এখান থেকে বুঝা যায়, বেশি সংখ্যক হওয়া ইসলামের কোন পূর্বশর্ত নয়। ইসলাম চায় মানসম্পন্ন মুসলিম,যারা আল্লাহর দীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। সংখ্যা এখানে মূখ্য নয়। আল্লাহ চেয়েছেন, **‘তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম’** (আ’মালুন সালিহান), এটা চাননি যে, ‘তোমাদের মধ্যে কে আমলে বেশি’ (আ’মালুন কাছিরান)। বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা ছিলো মুসলিমদের তিনগুণ। ইয়ারমুকের যুদ্ধে কাফিররা ছিলো মুসলিমদের ৭০ গুণ। উভয় যুদ্ধেই মুসলিমরা বিজয়ী হয়। অপরদিকে, হুনায়ুনের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিলো, কাফিরদের চেয়ে বেশি। কিন্তু সে যুদ্ধে তারা পরাজয়ের সামনে পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহর রহমতে বিজয় আসে। আফসোস, বর্তমান মুসলিম উম্মাহ, তাদের সংখ্যাধিক্যের পরিসংখ্যান নিয়ে ব্যস্ত, কোন ধর্ম সবচেয়ে বেশি গতিতে বেড়ে চলেছে, কোনদেশে মুসলিম Growth rate কত ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে তারা ব্যস্ত; কিন্তু মুসলিমদের মান নিয়ে কোন চিন্তা হচ্ছে না। অথচ আল্লাহ আল-কুরআনে বারবার বলেছেন, বিজয় শুধুমাত্র তাঁর কাছ থেকে আসে, আর তাঁর বিজয় দানের ওয়াদা শুধু মুমিনদের জন্য।

দেড়শ কোটি মুসলিমের এত বিশাল সংখ্যাও কোন কাজে আসছে না, কারণ অধিকাংশ জনতা মানসিকভাবে পশ্চিমা দেশ ও তাদের আদর্শের দাসত্ব করে আসছে। রাখাল যেভাবে তার খেয়াল খুশি মত পালের ভেড়াদের যেদিকে খুশি সেদিকে নিয়ে যায়, এই পশ্চিমাদেশগুলোও আমাদের মুসলিমদের সেভাবে পালের ভেড়া বানিয়ে রেখে মানসিকভাবে গোলামে পরিণত করে রেখেছে।

- **তৃতীয়ত: 'তোমরা হবে সমুদ্রের ফেনা রাশির মতো, যা স্রোতে সহজেই ভেসে যায়।'**

এটা হচ্ছে, বেশি সংখ্যক হওয়ার পরও মুসলিম উম্মাহর এই অবস্থার একটি অসাধারণ বর্ণনা। সাগরের ফেনা বিপুল পরিমাণ পানির উপর ভেসে থাকে ঠিকই, বিপুল জলরাশি নিয়ে সে গর্ব করে, এই জলরাশি তার কোন কাজে আসে না। তার নিজের কোন দৃঢ় অবস্থান নেই। সাগরের ফেনার যেভাবে কোন শক্তি নেই, শুধু উপর থেকে দেখতে অনেক মনে হয়, অন্যদিকে নিচের পানির স্রোত তাকে যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যায়। ফলে এই সংখ্যা নিয়ে গর্ব করা এক প্রকার মিথ্যা আত্মতুষ্টি অনুভব করা। নিজেকে চালিত বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ফেনারাশির নেই, সাগরের ফেনাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিচের জলরাশি।

মুসলিম উম্মাহও সংখ্যায় বেশি, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাদের কোন ভূমিকা কিংবা অবস্থান নেই। তাদের প্রতিটি দেশই সুদভিত্তিক অর্থনীতি দিয়ে পরিচালিত, আল- কুরআন সুন্নাহ বিবর্জিত পশ্চিমাবাদের আবিস্কৃত গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-পুঁজিবাদী-রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাদের দেশগুলি পরিচালিত হচ্ছে। আর ইসলামের গন্ডি শুধুমাত্র মসজিদ ও কতিপয় পারিবারিক আইনে সীমাবদ্ধ। এ যেন সংখ্যায় বেশি হয়েও তারা সংখ্যালঘু. কাফের-মুশরিক-ইসলামের শত্রুরা ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে কিন্তু মুসলিমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের একটি কথাও বলতে পারে না। অথচ সমুদ্রের ফেনা রাশির মতোই মুসলিম উম্মাহ ও সংখ্যাধিক্য নিয়ে আনন্দিত, উল্লাসিত, গর্বিত। আর এই বিভক্তিই যে দুর্বল হওয়ার প্রথম শর্ত তাও কোরআনে পরিষ্কার বলা আছেঃ

"আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে/বিরোধে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব (ত্রাস) শত্রুদের মন থেকে চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে।"

~সূরা আনফাল ৮:৪৬

- **চতুর্থত: ‘আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন এবং তোমাদের মধ্যে আল-ওয়াহ্হান ঢুকিয়ে দিবেন।’**

এখান থেকে দুটি বিষয় প্রতীয়মান হয়।

ক. মুসলিমদের শত্রু আছে, মিত্র আছে। ইসলাম কোন বৈরাগ্যবাদী ধর্ম নয়, কিংবা ‘অহিংস পরমধর্ম’ প্রকৃতির গৌতমীয় বাণীতে বিশ্বাস করে না। বরং, ইসলামে ভালোবাসা ও ঘৃণা (আল ওয়ালা ওয়াল বা’রা) একটি গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট। অনেক আধুনিক এবং পরাজিত মন মানসিকতার অধিকারী মুসলিম যাদের মন-মগজ পশ্চিমা শিক্ষা-ব্যবস্থা, ডিস, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে সঠিক ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে, তারা যতই এ ব্যাপারটায় তাদের বিদেশি বন্ধুদের কাছে অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়েন না কেন; আল্লাহর রহমত, তিনি আল-কুরআন ও সহীহ হাদিসকে অবিকৃত রেখেছেন। তা না হলে এরা ইসলামকে বিকৃত করে কোথায় নিয়ে যেতো।

আল্লাহ বলেন:

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে আউলিয়া (সাহায্যকারী বন্ধু, অন্তরঙ্গ, অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের আউলিয়া। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে আউলিয়ারূপে গ্রহণ করলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। আল্লাহ জালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ 'আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই।' অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ তাআলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন - ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে। মুসলমানরা বলবেঃ 'এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি?’ তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে।

ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা

মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না।

এটি আল্লাহর অনুগ্রহ - তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।"

~ সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৫১-৫৬

মুসলিমদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বাদ দিয়ে, বিজাতীয় প্রভুদেরকে বন্ধু-অভিভাবক করে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

খ. মুসলিমদের উচিত তাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্থ রাখা। আর তাদের অন্তরে আমাদের ভয় থাকাটাই স্বাভাবিক । যদি না থাকে, বুঝতে হবে, কোন সমস্যা আছে। কারণ রাসুল (সা.), আমাদের দুরবস্থার একটি কারণ হিসেবে তাদের মনে, আমাদের ভয় না থাকাকে উল্লেখ করেছেন। আর আল্লাহ তো পবিত্র কুরআনে ঘোষণাই দিয়েছেন, যা বেশির ভাগ মুসলিম সেনাবাহিনী তাদের কুচকাওয়াজে না বুঝে মন্ত্রের মতো পাঠ করে থাকে।

‘আর তাদেরকে মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী সদা প্রস্তুত রাখবে যদ্দ্বারা তোমরা ভয় দেখাতে থাকবে আল্লাহর শত্রু আর তোমাদের শত্রুকে, আর তাদের ছাড়াও অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা খরচ করো তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে, আর তোমাদের সাথে কখনো জুলুম করা হবে না।’

~ সুরা-আনফাল ৮: ৬০

এ আয়াতের ব্যাখায় উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের উপর দন্ডায়মান অবস্থায় এই আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনেছি যে, 'তোমরা সামর্থ অনুযায়ী শক্তি অর্জন কর।' অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শক্তির ব্যাখ্যায় বলেনঃ

'জেনে রাখো! শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা, জেনে রাখো! শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা, জেনে রাখো! শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা।'

তাই কাফিরদের মনে ভয়-ত্রাস সৃষ্টি করা মুসলিমদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত ফরজ। কে আছে এমন যে আল্লাহর এই হুকুমকে অস্বীকার করতে পারে। আর এক্ষেত্রে মুসলিমরা শুধু ‘চোরের কাছে পুলিশ যে রকম ত্রাস সৃষ্টি করে’ যা ডা. জাকির নায়েক বলে থাকেন, সে রকম ত্রাস সৃষ্টিকারী নয়, বরং ‘সুলায়মান (আ.) যেভাবে বিলকিসের রাজত্বে তার শিরকের কারণে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন’ সে রকমও ত্রাস সৃষ্টিকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি সাল্লামকে যে ছয়টি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি হলঃ **‘আমি অনেক দূর থেকে শত্রুবাহিনীর মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বিজয় প্রাপ্ত হই’** – হাদিসটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা ছিলো, আমাদের প্রথম সমস্যা, আর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, আল্লাহ আমাদের মাঝে ‘ওয়াহ্হান’ ঢুকিয়ে দিবেন।

- **পঞ্চমত: জিজ্ঞেস করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওয়াহ্হান কি?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং ক্বিতালকে অপছন্দ করা’ অন্য বর্ণনায় মৃত্যুকে অপছন্দ করা।**

এখানে সমস্যা এবং সমাধান দুটোই চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে, পুঁজিবাদী ও সমাজাতান্ত্রিক বস্তুবাদী আদর্শ যখন মুসলিম দেশগুলোতে রপ্তানি করা হল, তখন থেকে মুসলিমরা নিজেদের স্বভাববিরুদ্ধ রকমের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী হয়ে গেল, দুনিয়ার সোনার হরিণের পিছনে ছুটতে লাগল। আখিরাতের জীবনের কথা বেমালুম ভুলে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেকটি হাদীসে বলেছেন,

'আনন্দনাশক বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর।'

~ তিরমিযি ২৩০৬, আহমদ ৮১০৪, ৮২৪১, ৮৬৩২, ৯০২৫, ১০২৬২

অপর এক হাদিসে এসেছে,

ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

একদিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন যেটি চতুর্ভুজের বাইরে চলে গেল। তারপর দু পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভিতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মেলালেন এবং বললেন,

'এ মাঝামাঝি রেখাটা হল মানুষ। আর চতুর্ভুজটি হল তার মৃত্যু; যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর বাইরের দিকে বর্ধিত রেখাটি হল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। আর ছোট ছোট রেখাগুলো নানা রকম বিপদাপদ। যদি সে এর একটাকে এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে আক্রমণ করে। আর অন্যটাকেও যদি এড়িয়ে যায়, তবে পরবর্তী অন্য একটি তাকে আক্রমণ করে।'

~ বুখারি ৬৪১৭, তিরমিযি ২৪৫৪, ইবন মাজাহ ৪২৩১, আহমদ ৩৬৪৪, ৪১৩১, ৪৪২৩, দারেমি২৭২৯

আল্লাহ বলেন,

"প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"

~ সূরা আম্বিয়া ২১:৩৫

"আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না; সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে যে লোক আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে আমি তাকে তাই দেবো। আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দেবো"

~ সূরা 'আলি-ইমরান ৩:১৪৫

"প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।"

~ সূরা 'আলি-ইমরান ৩:১৮৫

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না।

আল্লাহর পথে লড়াই কর এবং জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শুনেন।”

~ সূরা আল-বাক্বারা ২:২৪৩-২৪৫

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের তাফসীরে, মা’রিফুল কোরআনে এসেছেঃ

// হায়াত-মউত বা জীবন-মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন। যুদ্ধ বা জেহাদে অংশ নেওয়াই মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনি ভীরুতার সাথে আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যহতি লাভের উপায় নয়।...

...এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীকে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কেয়ামত ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা তা জেহাদ হোক কিংবা প্লেগ মহামারীই হোক, আল্লাহ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মুহুর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মুহূর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের ক্ষেত্রে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

...এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, মৃত্যুর ভয়ে জেহাদ থেকে পলায়ন করা হারাম। এ বিষয়টি কোরআনের অন্যত্র অত্যন্ত বিস্তারিতবভাবে বর্নীত হয়েছে। অবশ্য কোন কোন বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। (সূরা আনফাল ৮:১৫-১৬ এর তাফসীর দ্রষ্টব্য)

এটা একান্তই আল্লাহর কুদরত যে, সাহাবিগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় সিপাহসালার আল্লাহর অসি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) যার সমগ্র জীবনই জেহাদে অতিবাহিত হয়েছে, তিনি কোন জেহাদে শহীদ হননি; বরং রোগাক্রান্ত হয়ে বাড়ীতে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করার আক্ষেপে তিনি অনুতাপ করেছিলেন এবং পরিবারের লোকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ

‘আমি অমুক অমুক বিরাট বিরাট জেহাদে অংশগ্রহণ করেছি। আমার শরীরের এমন কোন জায়গা নেই যা তীর-বল্লম অথবা অন্য কোন মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে জখম হয়নি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ আমি গাধার মত বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি। আল্লাহ যেন আমাকে ভীরু কাপুরুষের প্রাপ্য শাস্তি না দেন। মৃত্যুভয়ে যারা জেহাদ থেকে সরে থাকতে চায়, তাদেরকে আমার জীবনের এ উপদেশমূলক ঘটনাটি শুনিয়ে দিও।’ //

আসলে, যুগে-যুগে কেবল মুনাফিকরাই জিহাদ-ক্বিতালের পাশ কাটিয়ে কাফিরদের সাথে আপোষ করে গেছে। আর এদের সাথে থেকে পথভ্রষ্ট হয় দুর্বল ইমানদাররা, আর যারা এই মুনাফিকদের সাথ অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব পাতে। কোরআনে আল্লাহ বলেনঃ

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।"

~ সূরা আত-তাওবাহ ৯:১৬

এই আয়াতের তাফসীরে মা’রিফুল কুরআনে এসেছে,

// ষষ্ঠদশ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা কি মনে কর যে, শুধু কলেমার মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবী শোনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ আল্লাহ প্রকাশ্য দেখতে চান কারা আল্লাহর রাহে জেহাদকারী এবং কারা আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে না। এ আয়াতে সম্বোধন রয়েছে মুসলমানদের প্রতি। এদের মধ্যে কিছু মুনাফিক প্রকৃতির, আর কিছু দুর্বল ঈমানসম্পন্ন ইতস্ততকারী, যারা মুসলমানদের গোপন বিষয়গুলো নিজেদের অ-মুসলিম বন্ধুদের বলে দিত। সেজন্য অত্র আয়াতে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দু'টি আলামতের উল্লেখ করা হয়েছে।

নিষ্ঠাবান মুসলিমদের দুই আলামতঃ প্রথম, শুধু আল্লাহর জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে। দ্বিতিয়, কোন কোন অমুসলমানকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করে না। এ আয়াতের শেষে বলা হয় – "আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত" ।তাই তাঁর কাছে কোন হীলা-বাহানা চলবে না। //

আর মুনাফিকদের সাথে উঠা-বসার ফলে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, অন্তরে রোগ তৈরি হয়, ভয় তৈরি হয়। যেমনটা দেখা যায়, তাবুক যুদ্ধের সেই তিন সাহাবীর বেলায়, যারা সেই যুদ্ধের আগেও বায়'আতে আক্বাবা ও অন্যান্য জিহাদে অংশ নেন। কিন্তু নানা ঘটনাচক্রে এবং মুনাফিকদের সাথে উঠাবসা ও পরামর্শ আদানের ফলে তাঁদের পদস্খলন ঘটে; তাঁরা জিহাদে যোগ দেননি। পরবর্তিতে প্রায় ৫০ দিন শাস্তিস্বরূপ একঘরে করে রাখার পর আল্লাহর আয়াত নাযিল হয়, যেখানে তাঁদের তাওবাহ কবুলের উল্লেখ থাকে; অতঃপর সাহাবীগণ তাঁদেরকে বরণ করে নেন। আল্লাহ তাঁদের ঘটনা উল্লেখ (সূরা তাওবাহ এর ১১৮-১১৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য) করে বলেনঃ

"ওহে যারা ঈমান এনেছ!, আল্লাহর ভয়ে সদা-সচেতন থাক (তাক্বওয়া অর্জন কর) এবং সত্যবাদীদের (সাদেক্বীন) সাথে থাক।"

~ সূরা আত-তাওবাহ ৯:১১৯

সাদেক্বীন-গণের কিছু অপরিহার্য গুণ উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যবাদী।"

~ সূরা হুযুরাত ৪৯:১৫

হিজরত, যুদ্ধে যোগদান এবং এতে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ - রাসূলের (সাঃ) আনুগত্যের পথে একটি বড় বাধা হল স্ত্রী-সন্তানদের আনুগত্য ও তাদের কথায় দুর্বল হয়ে পড়া. তাই আল্লাহ বলছেনঃ

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলুল্লাহর আনুগত্য কর।

যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌছে দেয়া।

আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। অতএব মুমিনগণ আল্লাহর উপর ভরসা করুক।

ওহে যারা ঈমান এনেছ!, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন।

অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়।

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর ভয়ে সদা-সচেতন থাক (তাক্বওয়া অর্জন কর), শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর।

এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পন্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।

আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।"

~ সূরা তাগাবুন ৬৪:১২-১৮

তাফসীরে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তাফসিরে মা'রিফুল কোরআনে এই অংশ আলোচনার এক পর্যায়ে একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়ঃ

// রসূলে করীম সাঃ সন্তানদের সম্পর্কে বলেনঃ

'সন্তান-সন্ততি হচ্ছে মানুষের মানুষের কৃপণতা ও কাপুরুষতার কারণ। তাদের মহব্বতের কারণে মানুষ আল্লাহর পথে টাকা পয়সা ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে এবং তাদেরই মহব্বতের কারণে জিহাদে যোগদান করা থেকে গা বাঁচিয়ে চলে।' //

এভাবে আল্লাহ আরও বলেনঃ

"পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না।তিনি তোমাদের কাছে ধন-সম্পদ চাইলে অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন।

শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে (জিহাদে) ব্যয় করার আহবান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে।

যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্থ।

যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।"

~ সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৩৬-৩৮

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের বাপ-দাদা তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের পত্নীরা, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর - এগুলোর কোনওটি আল্লাহ,

তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর (আযাবের) বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।"

~ সূরা আত-তাওবাহ ৯:২৪

দেখা যাচ্ছে, যেই আটটি বিষয় মানুষের সবচেয়ে প্রিয় তার থেকেও আল্লাহ বলেছেন তাঁকে, তাঁর রাসূলকে অতঃপর জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহকে বেশি ভালোবাসতে। আর ভালোবাসা শুধু মুখে প্রকাশ করার ব্যাপার নয়, বরং মুখে বলার সাথে সাথে সেইরূপ কাজও করে দেখাতে হবে। তাহলেই আশা করা যায়, অন্তরের ইখলাস প্রমাণের সুযোগ হবে, আর আল্লাহ তো অন্তরের খবর রাখেন।

ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহ এমন একটি মহান দায়িত্ব যে, যুদ্ধের মাঠে যদি শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে যদি কোনও কারণে নামাজের নির্ধারিত সময় পার হয়ে যায় (সুযোগ থাকলে অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের ভিতর সালাত কায়েম করতে হবে) , তবে সেই দেরি করার কারনে কোনও গুনাহ নেই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাঃ একবার ময়দানে যুদ্ধরত থাকার ফলে আসর নামাজ ক্বাযা করে ফেলেন এবং বলতে থাকেনঃ **'আল্লাহ কাফেরদের ধ্বংস (মতান্তরে ক্বতল) করুন। তারা আমাদের নামাজ থেকে সরিয়ে রেখেছে।'**

জিহাদ ফী সাবিল্লাহ এমনই একটি মহান দায়িত্ব যে, যখন ফরজে 'আইন (ব্যাক্তিগত পর্যায়ে ফরজ) হয়ে যায়, তখন জিহাদে অংশ নেওয়ার জন্য বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী অথবা ঋণদাতার অনুমতি লাগে না। বর্তমানে যে, আমাদের উপরে জিহাদ ফরজে 'আইন হয়ে গিয়েছে, কাফেরদের দখলকৃত মুসলিম ভূমি পুনরুদ্ধার যে ফরজ, এ বিষয়ে চার মাজহাবের ঈমামগণসহ ঈমাম ইবনে তায়িমিয়্যাহ এবং আরও অনেক উলামা-মাশায়েখের ফতোয়া আছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পরবর্তি নোটের শেষে উল্লেখিত জিহাদ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি নিরসন মূলক অডিয়গুলো শুনার অনুরোধ করছি। এছাড়াও দেখুন তাফসীরঃ সূরা বাক্বারা এর ২১৬ নং আয়াত, মা'রিফুল কোরআন।

- **ষষ্টত: আল ওয়াহহান এর দুটি সমস্যার সমাধান, এমন কি মুসলিম উম্মাহর সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাদিসের মধ্যে।**

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

'যখন মানুষ দিনার এবং দিরহামের মধ্যে ডুবে যাবে, এবং যখন ঈনা (সুদী) ব্যবসায় জড়িত হয়ে যাবে, আর গরুর লেজ-এ সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর লাঞ্চনা চাপিয়ে দিবেন, তিনি তা উঠিয়ে নিবেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের দ্বীনে ফিরত না যাবে।'

~ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ (২/২৮), তাবরানী (১২/৪৩৩), বায়হাকী (শুয়াবুল ঈমান ৭/৪৩৪), আবু ইয়ালা (১০/২৯)

তাই আমাদের সমস্যা কোন টাকা-পয়সার, প্রযুক্তি, ব্যবসা এর কমতি নয়, গরুর লেজ অর্থাৎ কৃষিকাজ-এর কমতি নয়, যা অনেক তথাকথিত ইসলামী বুদ্ধিজীবীরা মনে করে থাকেন। বরং আমাদের সমস্যা অন্য কোথাও। আমাদের লাঞ্চনার কারণ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দেয়া, ক্বিতাল করতে গিয়ে আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুকে ভয় করা আর দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে বেশী ভালোবাসা। আমরা শুধু দাওয়াত দিয়ে সারা জীবনেও এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না, যতক্ষণ আমরা জিহাদ-ক্বিতাল (যুদ্ধ) না করি, যতক্ষণ আমরা মৃত্যুকে ভয় করি আর পরকালকে উপেক্ষা করি।

"তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না" *(সূরা বাক্বারা ২:২৯৪)* - এই আয়াতাংশের তাফসীরে, মা'রিফুল কুরআনে বলা হয়েছে,

// আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট। ওখানে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। এখন কথা হলো যে, 'ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা' বলতে

এক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়েছে? এ প্রসংগে মজীদের ব্যাক্ষাতাগণের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। ইমাম জাসসাস ও ইমাম রাযী (রাহঃ) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাঝে কোন বিরোধ নেই। প্রত্যেকটি উক্তিই গৃহীত হতে পারে। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কথা হল এই যে, আল্লাহ তাআলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে বসবাস করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটি নাযিল হলো। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, **'ধ্বংসের' দ্বারা এখানে জেহাদ পরিত্যাগ করাকেই বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জেহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধংসেরই কারণ। সেজন্যই হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) সারা জীবনই জেহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন।**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হুযায়ফা (রাঃ), কাতাদা (রাঃ), মুজাহিদ ও যাহহাক (রঃ), প্রমুখ তফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। //

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাসীরে বর্ণিত হয়ঃ

// হযরত আবু ইমরান (রঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার মুহাজিরগণের এক ব্যক্তি কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্যবাহিনীর উপর বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ চালান এবং তাদের বুহ্য ভেদ করে শত্রু সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তখন কতগুলো লোক পরস্পর বলাবলি করে 'দেখ! এই ব্যক্তি স্বীয় হস্তদ্বয় ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।' হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) একথা শুনে বলেনঃ 'এই আয়াতের সঠিক ভাবার্থ আমরাই ভাল জানি। জেনে রেখো যে, এই আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়। আমরা রাসূল সাঃ এর সাহচর্যে থেকেছি, তাঁর সাথে যুদ্ধ জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছি এবং সদা তাঁর সাহায্যের কাজেই থেকেছি। অবশেষে ইসলাম বিজয়ীর বেশে প্রকাশিত হয় এবং মুসলমানগণ জয় লাভ করে। তখন আমরা আনসারগণ একদা একত্রিত হয়ে এই পরামর্শ করি যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবীর (সঃ) সাহচর্যে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আমরা তাঁর সেবার কার্যে নিযুক্ত থেকেছি এবং তাঁর সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছি। এখন আল্লাহর ফযলে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে, মুসলমানগণ বিজয়ী হয়েছেন এবং যুদ্ধের

সমাপ্তি ঘটেছে। এতদিন ধরে না আমরা আমাদের সন্তানাদির খবরা-খবর নিতে পেরেছি, না মাল-ধন, জমি-জমা ও বাগ-বাগিচার দেখাশুনা করতে পেরেছি। সুতরাং এখন আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া উচিত। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং **জিহাদ ছেড়ে দিয়ে ছেলে-মেয়ে ও ব্যাবসা বানিজ্যের প্রতি মনোযোগ দেয়া যেন নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ারই শামীল।**' (সুনান-ই-আবু দাউদ। তিরমিযী, সুনান-ই-নাসায়ী ইত্যাদি) //

পূর্বে উল্লেখিত সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াত থেকেও পরিষ্কার যে, নিজেদের উপর আযাব আসার একটা কারণ হল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহকে কেবল কম গুরুত্ব দেওয়া, আর যাদের জিহাদ-ক্বিতালের কথা শুনলেই বিরক্ত লাগে, ভ্রু কুচকে যায়, যারা এটা এড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই, পরিত্যাগ করার মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পায় তাদের কথা আর কি বলার আছে! সূরা আল-বাক্বারা, আলি-ইমরান, আন-নিসা, আনফাল, আত-তাওবাহ, আহযাব, মুহাম্মাদ, ফাতহ, আল-হাশর, আল-মুজাদিলা, মুমতাহিনা, আল-মুনাফিক্বুন - এসব সূরা আর তাদের তাফসীর থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুনাফিক আর তাদের সাথে উঠা-বসা করা দুর্বল ঈমানের ব্যক্তিরাই কাফেরদের সাথে সখ্যতা গড়ে, আর ক্বিতাল থেকে এড়িয়ে যায়। মুলত মৃত্যু থেকে গাফেল হওয়ার অর্থ পরকালকে উপেক্ষা করা আর দুনিয়ার মোহে আকৃষ্ট থাকা। আর এটাই জিহাদ-ক্বিতাল অপছন্দ করা, পরিত্যাগ করা সহ সব রকম পাপের মূল।

আল্লাহ বলেনঃ

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে (ক্বিতালে) বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে?অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"

~ সূরা আত-তাওবাহ ৯:৩৮-৩৯

এ আয়াতদ্বয়ের তাফসীরে মা'রিফুল কুরআনে এসেছে,

// দুনিয়ার মোহ ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূলঃ

অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা' এক বিশেষ গটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, দ্বীনের ব্যাপারে সকল আলস্য, নিষ্ক্রিয়টা ও সকল অপরাধ এবং গোনাহের মূলে রয়েছে দুনিয়া প্রীতি ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। হাদীস শরীফে আছে - 'দুনিয়ার মোহ সকল গোনাহের মূল' সেজন্য আয়াতে বলা হয়ঃ

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কি হল, আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর (চলাফেরা করতে চাও না)? আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই পরিতুষ্ট হয়ে গেলে?"

রোগ নির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিকার উল্লেখ করা হয়েছে যে, **"পার্থিব জিন্দেগীর ভোগের উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি নগন্য"**

সারকথা হল, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের কথা চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়।

ইসলামী আকীদার মৌলিক বিষয় তিনটিঃ তাওহীদ, রেসালাত ও পরকালে বিশ্বাস। তন্মাধ্যে পরকালের বিশ্বাস হল বিশুদ্ধ আমলের রূহ এবং গোনাহ ও অপরাধের ক্ষেত্রে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। চিন্তা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা আখেরাতের আকীদা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুবাদি উন্নতির এখন যৌবনকাল। অপরাধ দমনে সকল জাতি ও দেশের চেষ্টা তদবিরের অন্ত নেই। আইন-আদালত ও অপরাধ দমনকারী সংস্থাসমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনা সবই আছে। কিন্তু তা সত্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেড়েই চলছে। আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক রোগ ও তার প্রতিকার নেওয়া হচ্ছে না বলেই আজকের এই অস্থিরতা। বস্তুতঃ এ সকল রোগের মূলে রয়েছে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা পার্থিব ব্যস্ততা এবং আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। আমাদের বিশ্বাস এর একমাত্র প্রতিকার হল আল্লাহর যিকির ও স্মরণ এবং আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা। যে দেশে যখন এই অমোঘ প্রতিকার প্রয়োগ করা হয়, সে

দেশ ও সমাজ মানবতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ফেরেশতাগণেরও ঈর্ষার পাত্র হয়েছিল। নবী ও সাহাবায় কেরামের স্বর্ণযুগ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আজকের বিশ্ব অপরাধ প্রবণতার উচ্ছেদ চায়, কিন্তু আল্লাহ ও আখেরাতের থেকে উদাসীন হয়ে পদে পদে এমন ব্যবস্থাও করে রাখছে, যার ফলে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি মনোযোগ আসে না। তাই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, অপরাধ দমনের সকল উন্নত ব্যবস্থাপনাই ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। অপরাধ দমন তো দূরের কথা, ঝড়ের বেগে যেন তা' বৃদ্ধি পাচ্ছে। হায়! আজকের চিন্তাশীল মহল যদি উপরোক্ত কোরআনী প্রতিকার প্রয়োগ করে দেখত, তবে বুঝতে পারত, কত সহজে অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ সাধন করা যায়।

৩৯ নং আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেয়া হয় যে, **"তোমরা জেহাদে বের না হলে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দ্বীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" //**

পূর্বে উল্লেখিত *সূরা মায়িদার ৫৪ নং আয়াতেও* আমরা দেখি, দ্বীনের থেকে ফিরে গেলে, বিমূখ হলে, আল্লাহ এমন জাতি তৈরি করবেন, যাদের একটি গুণ **'তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।'** এই আয়াতাংশের তাফসীরে, মা'রিফুল কুরআনে বলা হয়েছে,

// তারা সত্যধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জেহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবেলায় শুধু কতিপয় প্রচলিত এবাদত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠীত করার জন্য উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্য চতুর্থ গুণ **'কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না'** বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোন ভর্তসনাকারীর ভর্তসনারই পরওয়া করবে না। চিন্তা করলে বুঝা যায়, যে কোন আন্দোলন পরিচালনার পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হয়ে থাকে। প্রথমতঃ বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়তঃ আপন লোকদের ভর্তসনা ও তিরষ্কার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেল-জুলুম, জখম, হত্যা ইত্যাদি বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না। কিন্তু আপন লোকদের ভর্তসনা-বিদ্রুপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মবীরদেরও পদস্খলন ঘটে। সম্ভবতঃ একারণেই আল্লাহ

তাআলা এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, **তারা কারও ভর্তসনার পরওয়া না করে জেহাদ অভ্যাহত রাখবে। //**

এখানে আরও উল্লেখ্ করা হয়েছেঃ

// রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খলিফা আবুবকর (রাঃ) এর কাঁধে অর্পিত হয়। একদিকে তাঁরা ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বিয়োগ ব্যাথায় মুহ্যমান; অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও বিদ্রোহের হিড়িক। হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহর মৃত্যুর পর আমার পিতা হযরত আবুবকরের উপর যে বিপদের বোঝা পতিত হয়, তা কোন পাহাড়ের উপর পতিত হলে পাহাড়ও চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন।

এটা জানা কথা যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) ছাহাবায় কেরামের কাছে পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। ছাহাবায় কেরাম অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামী দেশটির উপর চড়াও হয়ে পড়তে পারে এমন আশংকাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় সিদ্দীকের অন্তরকে (ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে) এ জেহাদের জন্য পাথরের মত মজবুত করে দিলেন। তিনি ছাহাবায় কেরামের সামনে এমন এক মর্মভেদী ভাষণ দিলেন, যার ফলে এ জেহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারও মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রইল না। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দৃঢ়তা ও অসম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেনঃ

'যারা মুসলমান হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামী আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সব জিন-মানব ও বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষ-প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি একা এ জেহাদ চালিয়ে যাব।'

একথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন ছাহাবায় কেরাম সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে এক জায়গায় বসিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য মানচিত্র তৈরি করে ফেললেন। //

হাদীসে এসেছে,

সালামাহ বিন নুফাইল (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম, এমন সময় একজন লোক এসে তাকে বললেনঃ 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, ঘোড়াগুলোকে (জিহাদের জন্য ব্যবহার না করে আস্তাবলে রেখে দিয়ে) অপদস্থ করা হচ্ছে এবং অস্ত্র নামিয়ে রাখা হয়েছে, আর কিছু লোক বলাবলি করছে যে, আর জিহাদ করতে হবে না, জিহাদ শেষ হয়ে গিয়েছে!'

রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

'তারা মিথ্যা বলছে! যুদ্ধ তো কেবল শুরু হয়েছে, আমার উম্মাতের একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতেই থাকবে। বরং আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকে কারো কারো হৃদয়কে বক্র করে দিবেন যাতে তারা তাদের বিরদ্ধে লড়াই করতে পারে এবং এবং এই কিতাল থেকে তাদেরকে তিনি রিযক্ব দান করবেন যতক্ষণ না ক্বিয়ামাত কায়েম হয় এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা এসে যায়। ঘোড়ার কপালে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত রহমত থাকবে'

~সুনান নাসায়ি, হাদিস নং ৩৫৬১ – সাহিহ

সুতরাং পরিষ্কার হল যে, দুনিয়ার প্রতি মহব্বত আর পরকালকে উপেক্ষা করার ফলেই একজন কাফিরের সাথে সখ্যতা গড়তে পারে আর ক্বিতাল ছেড়ে দিতে পারে। কুরআনে আল্লাহ মানুষকে বার বার বলেছেন পরকালকে প্রাধন্য দিতে, আর দুনিয়াকে উপেক্ষা করতে। যখন মুসলিমরা অনুধাবন করবে যে, মৃত্যু আসলে সমাপ্তি নয়, বরং নতুন জীবনের শুরুমাত্র, আর আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, তখন এই উম্মাহর অবস্থা নিশ্চিতভাবেই বদলাতে শুরু করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়,

যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে,

এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়।

আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।

তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত।

এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্যে।

এটা আল্লাহর কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী।"

~ সূরা আল হাদীদ, ৫৭:২০-২১

অপর এক আয়াতে এসেছে,

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য।"

~ সূরা 'আলি-ইমরান ৩:১৩৩

এই আয়াতের তাফসীরে মা'রিফুল কুরআনে এসেছে,

// ১৩৩ নং আয়াতে ক্ষমার দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের পর এটি হল দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্ষমার অর্থ এমন সৎকর্ম, যা আল্লাহ তাআলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, 'কর্তব্য পালন', হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'ইসলাম', আবুল আলিয়া 'হিযরত', আনাস ইবনে-মালেক 'নামাযের প্রথম তাকবীর', সায়ীদ ইবনে-যুবায়ের 'এবাদত পালন', যাহহাক 'জেহাদ' এবং

ইকরিমা 'তওবা' বলেছেন। এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্ষমা বলে এমন সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে। //

তাই তো আল্লাহ বলেছেনঃ

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়।

আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, 'আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি।'

পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ আসলে তারা এমন ভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই (পূর্ব-যোগাযোগ, পূর্বপরিচয়) ছিল না। (তারা বলবে) 'হায়, আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমি ও যে সফলতা লাভ করতাম।'

কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের ক্বিতাল করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।

আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।'

যারা ঈমানদার তারা যে, ক্বিতাল করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা ক্বিতাল করে তাঘুতের* পক্ষে সুতরাং তোমরা ক্বিতাল করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।“

তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে (যুদ্ধ করা থেকে) সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক?

অতঃপর যখন তাদের প্রতি ক্বিতালের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, 'হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর ক্বিতাল ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না।'

(হে রসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না।

তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও।”

~ সূরা নিসা ৪:৭১-৭৮

[* তাগুত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের সাইটে তাগুত বিষয়ক দেখুন]

“আর যেদিন দুদল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য যে, তাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায়।এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল।

আর তাদেরকে বলা হল ‘এসো, আল্লাহর রাহে যুদ্ধ কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর।‘

তারা বলেছিল, ‘আমরা যদি জানতাম যে, যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম।’

সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে। বস্তুতঃ আল্লাহ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে। ওরা হলো যে সব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, 'যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না।' তাদেরকে বলে দিন, 'এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।'

আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয় ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে; এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।"

~ সূরা 'আলি-ইমরান ৩:১৬৬-১৭১

"তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদেরই পাপের দরুন।

ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের ভাই বন্ধুরা যখন কোন অভিযানে বের হয় কিংবা জেহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে মরতোও না আহতও হতো না।'যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই, তোমরা যা কিছুই কর না কেন, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন।আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। আর তোমরা মৃত্যুই বরণ কর অথবা নিহতই হও, অবশ্য আল্লাহ তাআলার সামনেই সমবেত হবে।"

~ সূরা 'আলি-ইমরান ৩:১৫৫-১৫৮

এর আগ পর্যন্ত আল্লাহ বলছেন:

"আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।"

~ আর রাদ ১১

[[আলহামদুলিল্লাহ। সমাপ্ত।]]

[আপনাদের আন্তরিক প্রর্থনায় আমাদেরকে ভুলবেন না]

https://islameralo.wordpress.com